www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

এ পরবাসে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

গত বার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কদ্দিনই বা হবে, বড় জোর বছর তিনেক। মনে আছে, উঁচু পাঁচিল ঘেরা হলুদ বাড়িটার পাশের কালো গেট ঠেলে ঢুকেছি, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি চারদিক, হঠাৎই সামনে সিঁড়ির মুখে সেই বৃদ্ধা। লোলচর্ম, শীর্ণকায়া। দেখে মনে হয় বয়সের কোনও গাছপাথর নেই। অন্তত, আশি-পঁচাশিটা শীত তো পার করেছেনই। পশ্চিমের রোদ সরাসরি পড়ছিল তাঁর মুখে, জীর্ণ হাতখানাকে সানশেড করে চোখ কুঁচকে দেখছিলেন আমাকে। সে এক আজব নিরীক্ষণ। তাকানোটা দেখে গা শিরশির করে ওঠে।

হঠাৎই বৃদ্ধা আঙুল নেড়ে ডাকলেন আমাকে। কাছে গেলাম পায়ে পায়ে। ঠোঁটে হাসি টেনে বললাম, 'কেমন আছেন, মাসিমা?'
কানের পাশে ডানা মেলল কাঁপা কাঁপা শীর্ণ আঙুল। হলদেটে চোখ পিটপিট করে উঠল, 'ছেলেমেয়ে ক'টি?'

কী প্রশ্নের কী উত্তর! বুঝলাম কান দুটো একেবারেই গেছে। হেসে ফেলে গলা ওঠালাম, 'আমার একটিই মেয়ে, মাসিমা।'
'আহ্, চেঁচাস কেন? আমি কি শুনতে পাই না?.... মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?'
'হ্যাঁ, মাসিমা।'
'জামাই দেখে? মেয়ে খোঁজখবর নেয়?'
'তা, নেয়।'
'কাছে নিয়ে গিয়ে রাখে?'

তখনও অত জেরার কারণ বুঝিনি। সরল ভাবেই বললাম, 'মেয়ে-জামাই এখানে

থাকে না, মাসিমা। তারা এখন বাঙ্গালোরে। আসে মাঝেমধ্যে। আমিও যাই...'

কথা শেষ করতে দিলেন না বৃদ্ধা, ঘাড় নাড়ছেন ঢকঢক, 'বুঝিছি, বুঝিছি। তোরও আমারই মতো কপাল।' হাত ধরে টানলেন কাছে। গোপন খবর দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'শোন, ওপরে একটা সিট খালি হয়েছে। এক্ষুনি অফিসে গিয়ে ধর, তোকে নিয়ে নেবে।

এতক্ষণে বোধগম্য হল। অশীতিপর মাসিমাটি ধরেই নিয়েছেন, আমি সিটের খোঁজে এসেছি তাঁদের বৃদ্ধাশ্রমে। নিজের জন্য। আমার যে বৃদ্ধাশ্রমে আসার মতো বয়স হতে খানিক দেরি আছে, এ বোধটুকুও এখন নেই মাসিমার। তিনি শুধু একটাই কথা বোঝেন, ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে মা'দের চলে আসতে হয় এই ওল্ড এজ হোমে।

খবর নিয়ে জেনেছিলাম অনেক কাল ধরেই ওই বৃদ্ধাশ্রমে আছেন তিনি। আজকাল কেউ আর আসে না তাঁর কাছে। ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি— কেউ না। সেই কোন কালে কে যেন এসে রেখে গিয়েছিল, প্রথম প্রথম টাকা পাঠাত। তার পর কবে থেকে যেন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ডরমিটরিতে থাকা-খাওয়ার খরচ মাসে মাত্র পাঁচশো টাকা, সেটুকু দেওয়ার মতোও কেউ নেই। মানবতার খাতিরে বৃদ্ধাবাস কর্তৃপক্ষই দিচ্ছেন খাইখরচ। আর, ওই ক্ষ্যাপাটে বৃদ্ধা যার সঙ্গেই নতুন সাক্ষাৎ হয়, প্রশ্ন করেন বাঁধা গতে। ছেলেমেয়ে দেখে? খোঁজ নেয়? বুঝিছি, বুঝিছি, লজ্জা পেতে হবে না, যা ওপরে একটা সিট খালি হয়েছে....।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল সে দিন। বড় মায়া হয়েছিল বৃদ্ধাকে দেখে। আহা রে, তাঁর যা বয়স, মনে হয় তাঁর ছেলেমেয়েও এখন বার্ধক্যের ঘরে। হয়তো বা নাতি-নাতনির ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে গেছে। তাদের কারও ভুল করেও কি কখনও মনে পড়ে না মানুষটার কথা? এমন এক জন, যিনি কিনা তাদের সংসারেরই ছিলেন এক সময়ে। গৃহিণী হয়ে। জন্ম দিয়েছিলেন তাদের বাবা-মা'র। কিংবা তাদের দাদু-ঠাকুমার। কিংবা তাদেরই। তিনি আদৌ বেঁচে আছেন কি না, এটুকুও জানতে ইচ্ছে করে না কারও? ঝড়তি-পড়তি মাল ভেবে বাতিল করে দিয়েই খালাস?

এমন নয় তো, বৃদ্ধার ছেলেমেয়েরাও এখন এমনই কোনও বৃদ্ধাশ্রমে? তাঁরাও হয়তো লোক দেখলেই প্রশ্ন ছোঁড়েন, ছেলেমেয়ে দেখে? খোঁজ নেয়? বুঝেছি, বুঝেছি। যা, দ্যাখ, একটা সিট বোধহয়...! হতে পারে। হতেই পারে। চাকা তো ঘোরে। গোবরও ঘুঁটে হয়ে পোড়ে একদিন।

আর একজন বৃদ্ধাকেও দেখেছিলাম সে বার। বয়স বড় জোর সত্তর-টত্তর। স্বামী মারা গেছেন, ছেলেপুলে নেই। ভাইরা থাকেন কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পাড়ায়, সংসারের গলগ্রহ বোনটিকে বৃদ্ধাশ্রমে ঢুকিয়ে দিয়ে মাস মাস টাকা পাঠিয়েই তাঁরা নিশ্চিন্ত, ভুলেও পা বাড়ান না বৃদ্ধাশ্রমে।

আমাকে এক কাঁড়ি উপদেশ দিয়েছিলেন সেই বৃদ্ধা। যে ভাবে পারবি, আগে নিজের জন্য সঞ্চয় করবি। বিকেলে নতুন করে উনুনে আঁচ দিবি না, সকালের

উনুনেই কাঠকয়লা ফেলে বিকেলের রুটি সেঁকে নিবি, তাতেও খানিক সাশ্রয় হয়। স্বামীর ওপর বেশি বিশ্বাস রাখবি না, খামচা মেরে টাকা সরিয়ে নিবি, নইলে দেখবি সেও কখন তোকে লবডঙ্কা দেখিয়ে ভেগে পড়েছে। আর, ভাইদের তো বিশ্বাস কর বিই না। নিজের টাকা নিজের কাছে রাখবি, ভুলেও ভাই যেন জানতে না পারে।

ভারী আশ্চর্য লেগেছিল মহিলাকে দেখে। কোন যুগে পড়ে আছেন? কয়লার যুগ পেরিয়ে এখন যে এল-পি-জি'র যুগ চলছে, মহিলা কি জানেন না? নাকি, গুলিয়ে ফেলেছেন সময়টাকে নিজের যৌবনকালের সঙ্গে? আর, কী তীব্র অবিশ্বাস নিয়ে এই শেষ কটা দিন বেঁচে থাকা! কী সাংঘাতিক অভিমান আপনজনদের ওপর, শেষ জীবনে!

এ বার অবশ্য গিয়ে ওই দুই বৃদ্ধার এক জনকেও দেখলাম না। চলে গেছেন তাঁরা, চিরতরে। মারা গিয়ে বেঁচে গেছেন। তাঁরা নেই বটে, তবে তাঁদের মতো এ রক ম অজস্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখন ছড়িয়ে আছেন বিভিন্ন হোমে। কারও সংসার সঙ্কুচিত হতে হতে এসে ঠেকেছে ডরমিটরির বারোয়ারি ঘরে একটা সিঙ্গল বেড, ক্ষুদে একটা আলমারি, আর খাটের নীচে সাপটে রাখা টুকিটাকি জিনিসপত্রে। কপাল জোরে কারও জুটেছে ছোট্ট কিউবিক্‌ল। একটু নিজের মতো করে সাজানো। আর মোটামুটি আর্থিক সঙ্গতি যাঁদের, আস্ত একখানা ঘর জোটাতে পেরেছেন। কখনও সে ঘর টিভি ফ্রিজে রীতিমতো ফারনিশ্‌ড। আছে অ্যাটাচড বাথও। কেউ ঠাঁই পেয়েছেন শহর থেকে দূরে, খানিক খোলামেলা পরিবেশে। কেউ বা আছেন এই ইঁটকাঠের জঙ্গলেই।

তা তাঁরা যেখানেই থাকুন, যে ভাবেই থাকুন, তাঁরা কিন্তু সংসারের বাইরের লোক। এঁদের অধিকাংশই একসময়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিলেন যে সংসারে, মনে করতেন তিনি বিহনে সেটি অচল, এখন সেই সংসারেরই সুখদুঃখ হাসি বেদনা কিছুতেই তাঁদের আর প্রত্যক্ষ অংশীদারি নেই। বড় জোর ভাল কোনও খবর পেলে আনন্দে উদ্বেল হতে পারেন, দুঃসংবাদে ডুকরে উঠতে পারেন একা একা। ওইটুকুই, তার বেশি নয়। হিন্দুশাস্ত্রে একেই কি বাণপ্রস্থ বলেছিল? সংসারের মোহ মায়া থেকে মুক্তি?

অবশ্য, আমাদের সমাজে, বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে, বিধবাদের কাশী-বৃন্দাবনে চালান দেওয়ার রেওয়াজ বহুকাল ধরেই তো চালু ছিল। বনেদি ঘরেরও কত মহিলা যে শেষ জীবনে বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে ভিক্ষে করে দিন কাটিয়েছেন! এমনও শুনেছি, ছেলে হাইকোর্টের জজ বা নামী ডাক্তার, অথচ তাঁর মা পড়ে আছেন বৃন্দাবনের রাস্তায়। ধর্ম-মোক্ষের বড়ি গিলে, মন্দিরে কীর্তন গেয়ে দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করছেন।

সর্বজয়া বলিল— যাও আর বসে থেকো না ঠাকুরঝি, বেলা হয়ে যাচ্ছে, ...এখানে তোমার জায়গা কোনো রকমে দিতে পারবো না— বুড়ি পুঁটলি লইয়া অতি কষ্টে আবার উঠিল। এই ভিটার ঘাসটুকু, ওই কত যত্নে পোঁতা লেবুগাছটা,...খুকী, খোকা, ব্রজপিসের ভিটা— তার সত্তর বৎসরের জীবনে এ সব ছাড়া সে আর কিছুই জানেও নাই, বুঝেও নাই। চিরকালের মতো তাহারা আজ দূরে সরিয়া যাইতেছে!

পথের পাঁচালী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুলনায়, আধুনিক বৃদ্ধাশ্রম তো রীতিমতো ভাল ব্যবস্থা। মোটামুটি সমবয়সীরা একসঙ্গে থাকছেন, ভাত-কাপড়ের চিন্তায় দুবেলা মাথা খারাপ করতে হচ্ছে না। খেটে অন্ন জোগাড় করার দায় নেই, দিব্যি ফ্যালো কড়ি মাখো তেল। অবসর বিনোদনের জন্যেও এখন প্রায় প্রতিটি বৃদ্ধাশ্রমেই টেলিভিশন মজুত। সিরিয়াল শুরু হলে টুকুস করে বসে পড় টিভির সামনে। কিংবা তাস-লুডো খেলো দল বেঁধে, আড্ডা মারো, বেড়াও। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের মনোরঞ্জনের জন্য আজকাল এগিয়ে এসেছে বহু সংস্থা, নাচ-গান-আবৃত্তির আসর বসিয়ে মধুর করে তুলছে এই আধুনিক বাণপ্রস্থকে। লাইব্রেরিও আছে বহু হোমে, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে পড়ে থাকতেও বাধা নেই, বারণ নেই আপন মনে থাকারও। পরনিন্দায় মেতে উঠলেও আটকায় কে?

এক দিকে এই পরিপূর্ণ ঝাড়া-হাত-পা হয়ে মুক্তির স্বাদ চাখার সুযোগ, অন্য দিকে যথা সম্ভব রসেবশে থাকার সুচারু আয়োজন— দুয়ে মিলে এ ধরনের বৃদ্ধাশ্রম তো নিজ গৃহে পর হয়ে থাকার চেয়ে ঢের ভাল। অনাদর অবহেলায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়! বুড়ো বয়সে অসুখ-বিসুখে হোমে ডাক্তার-বদ্যি পর্যন্ত মজুত। একেবারে অথর্ব হয়ে গেলে আছে সিক-রুম, পয়সা দিলে স্পেশাল অ্যাটেন্ডেন্টও রাখা যায়। ভাবনা কীসের?

এই সব কারণেই কি বৃদ্ধাশ্রমের চাহিদা বাড়ছে ক্রমশ? বছর ২৫-৩০ আগে লোয়ার সার্কুলার রোডে ক্রিশ্চিয়ানদের একটা ওল্ড এজ হোম ছিল। যেতে-আসতে দেখতাম সার সার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা উদাস বসে আছেন টানা বারান্দায়। এর বাইরে তেমন আর কিছু ছিল বলে তো মনে পড়ে না। হয়তো ছিল, লোকচক্ষুর প্রায় অগোচরে। এখন কলকাতা ও তার আশপাশে এক ডজনেরও বেশি বৃদ্ধাবাস। দূরদূরান্তেও তৈরি হয়েছে অজস্র হোম। সর্বত্রই ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই দশা। প্রায় সব হোমেই জমে আছে অগুন্তি আবেদনপত্র। পরিসংখ্যান দেখেই চোখ বুজে বলা যায় আধুনিক বাণপ্রস্থে যথেষ্ট উৎসাহী এখনকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

কিন্তু, না। ছবিটা বোধহয় ঠিক অত সোজা সরল নয়। হ্যাঁ, এ কথা মানতেই হবে, বেশ কিছু প্রবীণ মানুষ সত্যি সত্যিই স্বেচ্ছায় চলে আসেন ওল্ড এজ হোমে। বিয়ে থা করেননি, নিজে চাকরিবাকরি করতেন, বুড়ো বয়সে ভাইপো-ভাইঝিদের ঘাড়ে বসে থাকা পোষাবে না— এমন মানুষের বৃদ্ধাশ্রমই তো শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। আবার, কার ও হয়তো বা ছেলে নেই, মেয়ের সংসারে ঘাঁটি গাড়তে সংস্কারে বাধে, একা থাকতেও অস্বস্তি, নিজে থেকেই তাই চলে এলেন ওল্ড এজ হোমে।

এ সব মানুষরা মোটামুটি হাসিমুখেই মেনে নেন নতুন জীবনটাকে। অথবা বলা যায়, এই জীবনটাকেই চেয়ে নেন। একজন পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধাকে তো দেখলাম হোমে বসে গল্প কবিতা লিখছেন নিয়মিত। লিখছেন, পাঠাচ্ছেন সম্পাদকের দফতরে, সে লেখা ছাপাও হচ্ছে কখনও সখনও। নিজের উদ্যোগে বেশ কয়েকখানা বইও বার করে ফেলেছেন। হাঁটুতে, কোমরে ব্যথা, তবু ঘুরে ঘুরে আলাপ করে বেড়ান প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের সঙ্গে। এক সময় থাকতেন উত্তর কলকাতায়, স্বামী মারা যাওয়ার পর ভীষণ একা হয়ে পড়েন, তিন মেয়েই তখন কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চেয়েছিল, রাজি হননি। যদি আবার সেই ধরাবাঁধা জীবনে আটকা পড়ে যান! যদি কেউ তাঁর ওপর আবার কর্তৃত্ব ফলায়! যদি মেয়েদের সঙ্গে শেষকালে সম্পর্কটা তেতো হয়ে যায়! তার চেয়ে এই তো বেশ। খানিক তফাতে থাকুক, ভাল থাকুক। ইচ্ছে হলে আসবে তারা, নইলে নিজে গিয়ে দেখে আসবেন মেয়ে-জামাই-নাতিনাতনিদের।

আর এক মহিলাকেও দেখলাম। স্বামী মারা গেছেন, সন্তান নেই, নিজে চাকরি করতেন রেলে, রিটায়ারমেন্টের পরই পাড়ি জমিয়েছেন বৃদ্ধাবাসে। মাস মাস পেনশনটি তুলে আনেন ব্যাঙ্ক থেকে, বহাল তবিয়তেই থাকেন। নিজস্ব কিউবিক্‌লের মধ্যেই মিনি ঠাকুরঘর বানিয়ে নিয়েছেন, গোপালকে সেখানে খাওয়াচ্ছেন, স্নান করাচ্ছেন, ঘুম পাড়াচ্ছেন। তবে, স্বামীর ছবি নেই কোথাও। কেন? 'ঝুপ করে যদি মরে যাই, ঠাকুরদেবতাদের তো ফেলতে পারবে না, কিন্তু স্বামীর ছবিটিকে যে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেবে! তাঁর এই হেনস্থা কি সইবে প্রাণে? প্রাণ না থাকলেও?'

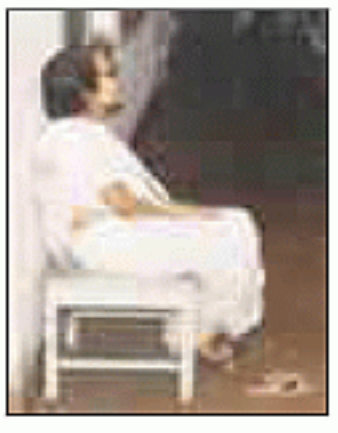

আজীবন কুমারীদের সংখ্যা যেমন কম নয়, বৃদ্ধদের ডেরাতে তেমনই আছেন বেশ কিছু চিরকুমার। সত্যি বলতে কী, ভীষ্মরাই সেখানে মেজরিটি। একজন নব্বই-পার ব্যাচেলর বৃদ্ধের দর্শন মিলল, যিনি ভুলেই গেছেন কবে থেকে আছেন হোমে। ঘোলাটে চোখে শুধু স্মরণ করতে পারেন পুব বাংলার গ্রামে শৈশব কেটেছে তাঁর, ভাইবোন মিলিয়ে তাঁরা ছিলেন একটা গোটা ফুটবল টিম। তাঁরা এখন কে কোথায়, বেঁচে আছেন, না

মরে হেজে গেছেন,
তাও এখন আর জানেন না তিনি। হোমই এখন তাঁর ঘরবাড়ি। রুমমেট, অ্যাটেন্ডেন্ট, হোম সুপারিনটেন্ডেন্টরাই প্রিয়জন।

এ ভাবেই বৃদ্ধাশ্রমকে যাঁরা ঘরবাড়ি ভেবে নিতে পেরেছেন, তাঁদের কাছে জায়গাটা মন্দ কী এমন! অপার সুখ না থাক, স্বস্তি তো আছে। কিন্তু, বৃদ্ধাশ্রমের বিশাল ক্যানভাসে শুধু এঁরাই তো নন, আছে আরও অনেক মুখ। তাঁদের বুকে কান পাতলে শোনা যায় গুমরনো কান্নার আওয়াজ। শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়েও সংসারকে আঁকড়ে বাঁচতে চান তাঁরা, তবু জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই ঠিকানায়। ডাঙায় তোলা মাছের মতো ছটফট করেন, চাতকের মতো তাকিয়ে থাকেন কবে কেউ আসবে দেখা করতে। আশায় বুক বাঁধেন, এ বার হয়তো তাঁকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। দু'পাঁচ দিনের জন্য? তাই সই। নাতিনাতনিকে চোখের দেখা তো দেখতে পাবেন। সংসারের আঁচে একটু তো সেঁকতে পারবেন ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসা দেহটাকে। কারও ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কখনও। কারও বা প্রতীক্ষাতেই কেটে যায় বাকি জীবনটুকু।

বৃদ্ধাশ্রম সম্পর্কে আমাদের কনসেপ্টটা কিন্তু গড়ে উঠেছে মূলত এঁদেরকে নিয়েই। পশ্চিমি দুনিয়ায় বুড়োবুড়ির বৃদ্ধাশ্রমে থাকাটা প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা, এ নিয়ে তাদের সমাজে তেমন হাহুতাশও নেই। তবে, আমরা তো এখনও ব্যাপারটাকে মন থেকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি, তাই কোথায় যেন লাগে। আমাদের প্রাচ্য দুনিয়ায় সম্পর্কের বন্ধনগুলো যে অনেক বেশি শক্তপোক্ত। এখানে ছেলেমেয়েকে শুধু মানুষ করা নয়, সাংসারিক জীবনে তাদের থিতু করে দেওয়াটাও মা-বাবার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলে মনে করা হয়। এই একুশ শতকে পৌঁছনোর পরেও। আঠারো বছর বয়স হয়ে গেলেই কি মা-বাবা সন্তানকে আলাদা করে দিতে পারেন? ছেলে দীর্ঘদিন বেকার থাকলেও তো তার ভরণপোষণের দায়িত্ব মা-বাবাই নেন। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বলে তাঁদের রাতের ঘুম চলে যায়। এমন একটা সামাজিক প্রেক্ষাপটে মা-বাবাও শেষ বয়সে ছেলেমেয়েদের কাছে কাছে থাকতে চাইবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। শুধুমাত্র নিজের সুখটুকু ষোলো আনা বজায় রাখবে বলে কোনও সন্তান যদি মা-বাবার দায়িত্ব থেকে হাত ধুয়ে ফেলতে চায়, সারাটা জীবন ওই সন্তানের কথা ভেবে হাড়মাস কালি হওয়া মা-বাবার তা বরদাস্ত হবে কেন? আমরাই বা কী করে মানব তা?

অনেকে হয়তো বলবেন, পুরনো মূল্যবোধও তো বদলায়। হক কথা। মূল্যবোধ এ মন কিছু অনড়, অটল জড়বস্তু নয়, যে প্রয়োজনের তাগিদেও তার বদল ঘটবে না। আর্থসামাজিক কারণে তার রূপান্তর ঘটে, এও অতি ধ্রুব সত্য। নইলে তো যৌথ পরিবারই এখনও টিকে থাকত রমরমিয়ে। তবু, সেন্টিমেন্ট বলেও তো একটা বস্তু আছে। স্বেচ্ছায় যদি কেউ সংসারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে চান, হোন না তিনি। কিন্তু, ঘেঁটি ধরে বিদেয় করা কেন?

স্বেচ্ছাতেও আসেননি, আবার অনিচ্ছেতেও নয়, এই দুয়ের মাঝামাঝি আর এক সম্প্রদায়ও আছেন বৃদ্ধাশ্রমে। আপাত দৃষ্টিতে তাঁরা নিজেই সরে এসেছেন স্বজন ছেড়ে, কিন্তু বুকের মধ্যে বরফ হয়ে আছে অভিমান। তাঁরা সহজে মুখ ফুটে ছেলেমেয়ের সমালোচনা করেন না, তবে প্রসঙ্গ জোর করে তুললে ভিজে আসে চোখ। দেখেই বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে পুড়ছেন তাঁরা, হাহাকারকে লুকিয়ে রাখছেন হাসিঠাট্টার মোড়কে।

এমনই বেশ কয়েক জন মহিলার সঙ্গে এ বার দেখা হল ওল্ড এজ হোমে। এক জনের তো বয়সও বেশি নয়, জোর ষাট-বাষট্টি। স্বামী চাকরি করতেন নামী প্রতিষ্ঠানে। ভদ্রলোকের আকস্মিক মৃত্যুর পর কোম্পানি তাঁর স্ত্রীকেই চাকরি দিতে চেয়েছিল, ভদ্রমহিলা নিজে না নিয়ে কাজটায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে। বিয়ে করার পর চোখ ফুটেছে ছেলের, মাকে আর তার সহ্য হচ্ছে না।

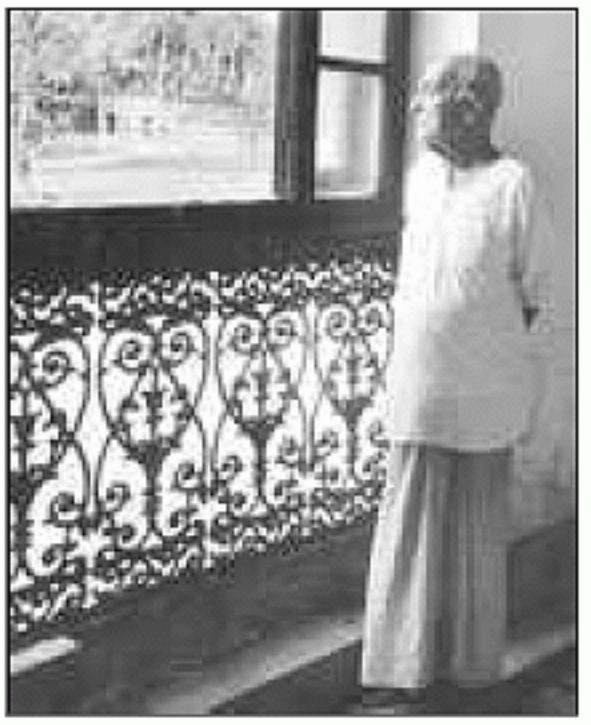

পুত্রবধূরও আদৌ পছন্দ নয় শাশুড়িকে। কথায় কথায়
খিটিমিটি চোটপাট অশান্তি। অগত্যা মা এই বৃদ্ধাবাসে। তবে, ওই যে বুক ফাটলেও মুখ ফুটবে না! মহিলা কিছুতেই দোষ দেবেন না ছেলের। ছেলের বউ-এরও না। কেন এলেন, প্রশ্ন করলে একটাই উত্তর: এখানেই আমার বেশি ভাল লাগে, তাই...। সাজানো সংসার ছেড়ে ডরমিটরিতে এসে তিনি নাকি সুখী! একটা তিন বাই ছয় খাট আর ছোট আলমারি সম্বল করে!

আর এক মহিলার দুই ছেলে। এক ছেলে আমেরিকায়, অন্য জন এ দেশে। এন-আর-আই ছেলের তো মাকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ছোট ছেলেও কলকাতা থেকে বদলি হওয়ার সময়ে মাকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন বৃদ্ধাশ্রমে। তাও বৃদ্ধা নিন্দে করবেন না ছেলের। আহা! কাঁহাতক আমায় ঘাড়ে নিয়ে ঘুরবে! ছেলে আমায় দেখে তো, টাকাপয়সা পাঠায়, আসে ন'মাসে ছ'মাসে। বলেই মহিলা পাঁচশো টাকার ডরমিটরির ফালি বিছানায় গুটিয়ে মুটিয়ে শুয়ে পড়েন। উল্টো দিকে মুখ করে।

সামান্য এই পাঁচশো টাকা, সাতশো টাকা, কী হাজার দেড় হাজার, থাকা খাওয়ার মাসিক এই খরচাটুকু দিতেও যে কত টালবাহানা চলে! পঁচাত্তর বছরের এক বৃদ্ধা ফ্যামিলি পেনশন পান মাত্র সাতশো। তাতে চলছে না বলে আর্জি জানিয়েছিলেন ছেলের কাছে। বিশাল ফ্ল্যাটে থাকা ধনী ছেলে দু-দুশো টাকা হাতখরচ মঞ্জুর করে ছিলেন মাকে, তাতেও চলছে না বলে আরও একশো বাড়িয়েছেন সম্প্রতি। কী মহানুভবতা! বৃদ্ধাকে বলেছিলাম, ছেলের নামে মামলা ঠুকতে পারেন তো আপনি। হোমে তো আপনাদের জন্য লিগাল এড সেল আছে। জানেন কি, সি-আর-পি-সি'র ১২৫ ধারা অনুযায়ী বৃদ্ধ মা-বাবাকে ভদ্রস্থ ভরণপোষণ দিতে ছেলেমেয়ে বাধ্য? শুনেই সন্ত্রাস্ত চেহারার বৃদ্ধাটি পলকে কাঁটা— ছেলের নামে কেস করব কী গো!

টাকাটা তো পাবেন। আপনার রাইট আছে চাওয়ার। তার পর ছেলে যদি আর আমার মুখ না দেখে? যাও বা এক-আধবার কাছে নিয়ে যায়, তাও যদি বন্ধ করে দেয়?

এ সব মায়েদের সন্তানরা কি কখনও ভাবে, তারাও এক দিন বৃদ্ধ হবে? তাদের ছেলেরাও একদিন গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়াবে হোমের অফিসে? আমতা আমতা করে বলবে, আমার এক রিলেটিভের জন্য একটা অ্যাকোমোডেশন হবে এখানে? রিলেটিভ মানে...মানে আমার বাবা... উনি নিজেই আসতে চাইছেন... বোঝেনই

তো বুড়ো মানুষের গোঁ....।

সত্যিকারের এক জন গোঁ-ধরা মানুষও দেখলাম। আশি পার হওয়া এক বৃদ্ধ। ঘরে স্ত্রী থাকতেও ওল্ড হোমে চলে এসেছেন, প্রায় জোর করে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ আছে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে নো সম্পর্ক।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মাসিমা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন না?
হাই পাওয়ারের চশমা, ফর্সা, সৌম্যকান্তি বৃদ্ধের নির্বিকার উত্তর, নাহ্।
বলেন কী? আপনিও যান না মাসিমার কাছে?
নাহ্।
ডরমিটরির পাশের বিছানা থেকে বছর সত্তরের এক বৃদ্ধ বলে উঠেছিলেন, ছোটমামা আর জীবনেও মামির কাছে ফিরবেন না।
কথাটা খুট করে লাগল কানে। ঘুরে বললাম, ছোটমামা বলছেন কেন? উনি কি আপনার...?
হ্যাঁ। আপন মামা। মা'র ছোটভাই। বলেই বৃদ্ধের ঠোঁটে মুচকি হাসি, আমরা মামা-ভাগ্নে দিব্যি আছি এখানে। নো কাউমাউ, নো ঝুটঝামেলা....
বৃদ্ধাশ্রমেও শেষে মামা-ভাগ্নে!
নাহ্, এই কেসটাই ঠিক মগজে ঢোকেনি। বোঝার চেষ্টা করছি।

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com